বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

আদি হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত

শ্রীসুকুমার সেন, এম্‌-এ, পিএইচ্‌-ডি
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Evergreen Bangla.com

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ

খেউড় তরজা আখড়াই হাফ্-আখড়াই দাঁড়া কবি কবিগান পাঁচালী ও যাত্রা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ব হইতে এক ধরণের আদিরসাত্মক গানের ঢঙ্গ ভাগীরথীতীরে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইহাকে বলিত খেউড় ('খেঁড়ু')। ভারতচন্দ্র বিদ্যার জবানীতে বলিয়াছেন,

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশের বিকৃতরুচি নাগরিক সংস্কৃতি (?) যখন কলিকাতাতে আসিয়া শিকড় গাড়িল তখন খেউড় গানের একমাত্র কেন্দ্র হইল ইংরেজরাজধানী। বাঙ্গালা দেশে বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে ইংরেজশাসন সুদৃঢ় করিতে যে বাঙ্গালীর দায়িত্ব সর্ব্বাধিক এবং যিনি ইংরেজ শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহলব্ধ মান-ঐশ্বর্য্যের নবগরিমায় মুর্শিদাবাদের রাজসভার দ্রুতম্লানায়মান ঔজ্জ্বল্যের অনুসরণে অনেক কিছু করিয়াছিলেন সেই মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর খেউড় গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নবকৃষ্ণের অনুচরমণ্ডলীর মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের নাম কুলুইচন্দ্র সেন। প্রধানতঃ ইঁহারই প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে খেউড় গান ওস্তাদি ঢঙ্গে মণ্ডিত ও মার্জ্জিত হইয়া 'আখড়াই' (অর্থাৎ আখড়া বা সঙ্গীতশালার উপযুক্ত) নামে পরিচিত হয়। কুলুইচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন রামনিধি গুপ্ত।[১] ইনি মার্জ্জিতরুচির প্রণয়গীতি রচনা করিয়া আখড়াই গানকে নাগরিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সহায়তা করেন। রামনিধি

১। নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপালের মতে কুলুইচন্দ্র রামনিধির "অতি নিকটসম্পর্কীয় মাতুলপুত্র ছিলেন" [গীতরত্ন গ্রন্থ (তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৫), পৃ ৷৹]। নবীনচন্দ্র দত্তের ও মনোমোহন বসুর মতে রামনিধি ছিলেন কুলুইচন্দ্রের ভাগিনেয় [গীতাবলী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১৩]।

গুপ্ত মহাশয় 'নিধু বাবু' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইঁহার কথা পরে বলিতেছি।

আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বন্ধ। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত, প্রথমে ভবানীবিষয়ক, তাহার পর প্রণয়গীতি (সাধারণতঃ মিলনের আর্ত্তিসূচক), শেষে প্রভাতী (রজনীপ্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ)। ইহাতে ধ্রুপদ খেয়ালের মত রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘবিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেইজন্যই। বাজনা ও সঙ্গতের বিশেষ পরিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার গতি (tempo) ছিল প্রধানতঃ চারিপ্রকার—পিড়ে- (বা পিঁড়ে) বন্দী (overture), দোলন (swing), সব-দৌড় (full tempo) এবং মোড় (climax)। আখড়াই গাওনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে উত্তরপ্রত্যুত্তর হইত না, যে দল গান বাজনায় শ্রেষ্ঠ হইত তাহারই জয় হইত।

আখড়াই গীতরচয়িতাদিগের মতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিধু বাবু। ইঁহার জন্ম হয় ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটে চাপতা গ্রামে মাতুলালয়ে। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ বাস করিতেন কলিকাতায় কুমার-টুলিতে। এইখানে থাকিয়া নিধু বাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিধুবাবু কর্ম্মসূত্রে ছাপরায় যান, সেখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় 'টপ্পা' (অর্থাৎ সংক্ষিপ্তাকার) গান রচনা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় "শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন, ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীতস্বরে মুগ্ধ হইতেন।

"নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মিত্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদা উল্লাস করিতেন, পক্ষির দলের পক্ষী সকল ভদ্রসন্তান উপস্থিতবক্তা এবং উপস্থিত কবি ও বাবু এবং সৌখিন নামধারী সুখী

ছিলেন, পক্ষির দলেরা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। পক্ষিগণ আপন আপন গুণানুসারে নাম পাইতেন এবং সেই নাম প্রায় নিধুবাবুর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া সুখী জ্ঞান করিতেন……

"১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে "আখড়াই" গাহনার অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অদ্বিতীয় পারদর্শি ছিলেন, তাহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়, তিনি ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন, কিন্তু নিধুবাবু তাঁহার পর আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইহাঁর কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

"১২১০ অব্দে যখন মহামান্য রাজকৃষ্ণ বাহাদুর "আখড়াই" আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস,[১] রাম ঠাকুর ও নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদাই "আখড়াই" সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইহাঁরা তাবতেই এ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

"১২১২ কিম্বা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়, তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান, এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয় দলে "বাদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৺কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত্ত হইলেন, তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানীবিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন, প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল……

"এই সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত

১। শ্রীদাম এবং সুবল দুই ভাই কৃষ্ণযাত্রা গাহনায়ও নাম করিয়াছিল। উভয়ের মৃত্যু হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে।

আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"[১]

১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র তারিখে নিধুবাবুর দেহত্যাগ হয়।

নিধুবাবুর গানের কিছু উদাহরণ দিই। গানগুলির আকার সংক্ষিপ্ত সংহত ও রসঘন। বিরহের জ্বালার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আস্বাদ নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠ গীতিগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ,
রাত্রদিন প্রাণ প্রাণ করে যারে মন।
হরিষবিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন,
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥ গীতরত্ন, পৃ ১১৯॥

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে,
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহে দেখি তারে,
নয়ন-অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে॥ ঐ, পৃ ৩২॥

পিরীতি রতননিধি পাইল যে জন
তাহার মনের মত না হবে কখন।
দুঃখেরে করিয়ে কোলে
ভাসয়ে সুখসলিলে,
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥ ঐ, পৃ ১৩৫॥

নিধুবাবুর রচিত একটি আখড়াই গান আদর্শ হিসাবে উদ্ধৃত

[ভবানীবিষয়ক]

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি সদাশিবে শুভঙ্করি,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনি।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞানবোধ সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী॥

১। গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ [।৶৹]—[॥৵৹]। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সালে সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রণতে প্রসন্না ভব, ভীমতর ভবার্ণব-
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহি গো তারিণী ॥

[খেউড়]

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।
সাধিয়ে আপন কাজ
এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল ॥

[প্রভাতী]

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন,
হলে কি ও বিধুমুখ হেরিয়ে মলিন ?
নলিনী হাসিবে কেন,
কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥ [ঐ, পৃ ১৪১] ॥

নিধুবাবুর অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে কবিরত্ন উপাধিক শ্রীধর কথকের কয়েকটি টপ্পা গানও বেশ চমৎকার। নিম্নে উদ্ধৃত সুপরিচিত গানটি এককালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সুখেতে ভাসি।
তাই আমি দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥[১]

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৩৫৮।

আখড়াই গান প্রকৃতপক্ষে ছিল কালোয়াতী বা ওস্তাদী সঙ্গীতের শাখা অতএব কষ্টসাধ্য। এ গানে কথা যৎকিঞ্চিৎ, সুর ও বাদ্যের বাহারই সব। এই কারণে আখড়াই গানের প্রতিপত্তি জনসাধারণের মধ্যে বেশি দিন টিকিল না। আখড়াই ভাঙ্গিয়া এক নূতনতর পদ্ধতি সৃষ্ট হইল, তাহার নাম অর্দ্ধ-আখড়াই নিম-আখড়াই বা হাফ্-আখড়াই। বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন, ইনিই হাফ্-আখড়াই পদ্ধতির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ কাজে মোহনচাঁদ নিধু বাবুর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

কবিগানের আদর্শে হাফ্-আখড়াইয়ে দুই দলের মধ্যে গানের মধ্য দিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া চলিত হইল। গানও সংক্ষিপ্ত আকারের রহিল না, গানের ও সুরের প্রাধান্য প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইল। রাগরাগিণীর elaboration বা পরিবর্দ্ধন অনেক কমিয়া গেল।

হাফ্-আখড়াই গান সাধারণতঃ প্রণয়ঘটিত, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছাঁচে ঢালা। কখনো কখনো অন্য পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর জবানীতেও রচিত হইত। হাফ্-আখড়াই গানের দুই প্রধান অঙ্গ ছিল, সখীসংবাদ ও খেউড়। সখীসংবাদ ও খেউড় অঙ্গের মধ্যে তিন (কখনো কখনো তাহারও বেশী) অংশ—মহড়া, তেহারান (refrain) এবং চিতেন। এক দল সখীসংবাদ গাহিয়া গেলে অপর দল আসিয়া প্রত্যুত্তরে সখীসংবাদ গাহিত। প্রতিপক্ষের গানে উত্তরের সঙ্গে যদি 'চাপান' অর্থাৎ নূতন challenge থাকিত তাহা হইলে প্রথম দলকে আবার আসিয়া দ্বিতীয় সখীসংবাদ গাহিতে হইত। সখীসংবাদ গাওয়া হইলে পর খেউড় গাওয়া হইত। খেউড় গানে ভাবে ও ভাষায় শ্লীলতার সীমা না মানাই ছিল সাধারণ রীতি। এই হিসাবে হাফ্-আখড়াই প্রাচীন খেউড় ও দাঁড়া কবি গানের অনুবর্ত্তী।

আখড়াইয়ের অপেক্ষা হাফ্-আখড়াই আরও অল্পকালস্থায়ী হইল। হাফ্-আখড়াই লোপ হওয়ার জন্য গীতপদ্ধতি দায়ী ছিল না, দায়ী হইল ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রসমাজের দ্রুত রুচিপরিবর্ত্তন। ভাষার অসংযম এবং ভাবের গ্রাম্যতার ফলে ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বেই

হাফ্-আখড়াই পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল। শেষের দিকে হাফ্-আখড়াই গান রচনায় নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তবে সাহিত্য হিসাবে এই সব গান সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইরূপ ছড়াকে বলিত আর্য্যা[১] অথবা তর্জ্জা[২] অথবা আর্য্যা-তর্জ্জা। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন, "আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে লোক বৈষ্ণব দেখিয়া।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, "তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।" বৌদ্ধ ও শৈব সাধকেরা প্রাচীনকাল হইতেই অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়া বা প্রহেলিকা রচনা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাই চর্য্যাগীতিতে। পরবর্ত্তী কালে শৈবসিদ্ধাদের গীতির মধ্যেও এইরূপ ছড়া ও গান পাই। শ্রীচৈতন্যের সময়েও শৈব সিদ্ধাদিগের ছড়া প্রহেলিকা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন, "মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।"

পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তরপ্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা গীত।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীতীরভূমিতে দাঁড়া কবির গাওনা জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীতরচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর গান রচনার ধারাও প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই 'কবিগান।' এইরূপ গীত যাঁহারা গান করিতেন তাঁহারা কবিওয়ালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। অনেক কবিওয়ালা স্বয়ং গান রচনা করিতেন।

১। মূলে এইজাতীয় ছড়া প্রাকৃতে আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত হইত বলিয়া এই নাম হয়।

২। আরবী শব্দ তর্জ., অর্থ কাঠামো, রীতি, ধরণ।

৩। তুলনীয় মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্ম্ম ঠাকুরের উক্তি, "নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥" 'দাঁড়া' শব্দকে কবিতার standard অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইতে 'বাঁধা গান বা ছড়া' অর্থ আসিয়া গিয়াছিল।

যাঁহারা গাহিতেন না শুধু গান রচনা করিতেন, তাঁহাদের বলিত 'বাঁধনদার।' প্রাচীন কবিগান রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতর হইতেছেন রাসু-নৃসিংহ, লালু-নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ী বা হরু ঠাকুর,[১] রাম বসু,[২] নিত্যানন্দ বৈরাগী,[৩] লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রামপ্রসাদ ঠাকুর,[৪] নীলু ঠাকুর,[৫] আণ্টুনি ফিরিঙ্গি (Hensman Anthony),[৬] ভোলানাথ নায়ক বা ভোলা ময়রা,[৭] রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।[৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে দুইজন কবি সাহিত্যে আধুনিক ধারায় সূত্রপাত করেন—ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁহার শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা এবং আরও অনেকে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন। বৈষ্ণবীদেরও কবির দল ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গোলোকমণি দয়ামণি ও রত্নমণি এই তিনজন "নেড়ি কবি" গাওনা করিতে আসিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১২] কবিগানের মধ্যে শ্লীলতার গণ্ডী প্রায়ই মানা হইত না, সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লোপ পাইল। এখনকার দিনে পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে তর্জ্জা গান ও ইহার রূপান্তর নেটো বা লেটো ('নাটুয়া') গান অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে।

কবিগাহনার প্রথম গান হইত "মালসী" বা ভবানী-বিষয়ক, তাহার পর সখীসংবাদ (ব্রজলীলা বিষয়ক), তাহার পর খেউড়, শেষে প্রভাতী।

পাঁচালী গানের উদ্ভব কীর্ত্তন গান হইতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কীর্ত্তনের পদ্ধতিতে কৃষ্ণলীলাত্মক পাঁচালী গান লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন মধুসূদন

১। জন্ম ১১৪৫ (?) মৃত্যু ২৩ শ্রাবণ ১২৩১। ২। জন্ম আনুমানিক ১১৮৫ সাল, মৃত্যু আনুমানিক ১২৩৬ সাল। ৩। জন্ম আনুমানিক ১১৫৮ সাল, মৃত্যু আনুমানিক ১২২০ সাল।

৪। নীলুঠাকুরের বড় ভাই। ৫। মৃত্যু ২৬ কার্ত্তিক ১২৩২।

৬। আণ্টনি ফিরিঙ্গির এই নাম হইতে অনুমান হয় যে তিনি পোর্ত্তুগীস জাতীয় ছিলেন না—সম্ভবতঃ তিনি মিশ্র ইউরোপীয় (ইংরেজ ?)-ভারতীয়, অথবা দেশী খ্রীষ্টান ছিলেন।

৭। সাহিত্যসংহিতা ১১, পৃ ২১-২৬, ২৮০-৯১, ৬৫৮-৬০। ৮। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় [১২৬ -৬১] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের বৃত্তান্ত প্রথম প্রকাশ করেন। অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত বঙ্গের কবিতা দ্বিতীয় ভাগ [পৃ ২৯৫ হইতে] ; বঙ্গভাষার লেখক [পৃ ৩৬৭-৮০] ; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে রচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengali Literature in the Nineteenth Century দ্রষ্টব্য। ১২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৫০।

কিন্নর ও রূপচাঁদ অধিকারী। পাঁচালীর পালা বাঁধা থাকিত এবং কীর্ত্তনের মতই ব্রজলীলাবিষয়ক হইত, ক্বচিৎ দেবীলীলাবিষয়ক। পাঁচালীর সহিত কীর্ত্তন গানের তফাৎ হইতেছে যে ইহাতে গায়ক অঙ্গভঙ্গি করিতেন, কখনও পাত্রপাত্রীর সাজও করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেন। গানের ঢঙ্গেও কীর্ত্তনের বিশুদ্ধি ছিল না, ইহাতে খেম্‌টা ও কবিগান পদ্ধতির প্রভাবও অনেক পড়িয়াছিল। পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এই মাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়ক বা পাত্র একটি, যাত্রায় একাধিক —সাধারণতঃ তিনটি। যাত্রার একটি বড় বিশেষত্ব ছিল নারদ মুনির "কাচ কাচিয়া" হাস্যরসের অবতারণা করা। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বা অন্যবিধ উৎসব। আধুনিক কালে "নদীর যাত", "মানাদের যাত" এই স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্যকাহিনীময় নাটগীতি। প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন। তাহার পর আসিল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। ক্রমে অপর কাহিনী যাত্রার পালার মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙ্গের আমদানী হয়, ফলে অধুনা যাত্রার মধ্যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন অল্পই রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেকার পাঁচালী গানের অশ্লীলতা কবিগানের অপেক্ষা বড় কিছু কম ছিল না। দাশরথি রায়ের হাতে পাঁচালীর কতকটা বিশুদ্ধীকরণ ঘটে। দাশরথি রায়[১] পাঁচালীরচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বহুপ্রসূতম। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (জন্ম ১২১২, মৃত্যু ১২৬৪) পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রার পালা লিখিয়া এবং কীর্ত্তনের ঢঙ্গে গাহিয়া পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস দত্ত[২] এবং (১২০৮-১২৮৩) রসিকচন্দ্র রায়[৩] (১২২৭-১৩০০) পাঁচালীর পালা লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন।

১। জন্ম ১২১২, মৃত্যু ১২৬৪। ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২০৫-২২১।
৩। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণযাত্রায় প্রথমযুগে নাম করিয়াছিলেন লোচনদাস অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী এবং দুই ভাই শ্রীদাম দাস ও সুবল দাস। তাহার পর গোবিন্দ অধিকারী।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীতীর অঞ্চলে যে গীতনাটের রীতি দাঁড়াইয়া যায় তাহার তিনটি মূল ধারা ছিল। একটি ধারা আসিয়াছিল প্রাচীন আর্য্যা-তর্জ্জা গান হইতে, দ্বিতীয়টি প্রাচীনতর কীর্ত্তনগান হইতে এবং তৃতীয়টি অচিরোদ্ভূত খেউড় গান হইতে। তর্জ্জাগান ছিল বিতণ্ডা বা প্রতিযোগিতামূলক, ইহা হইতে দাঁড়া কবির সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তনগান হইতে ঢপ (অর্থাৎ পাঁচালীর পূর্ব্বরূপ), তুক্ক (ভাঙ্গা কীর্ত্তন), পাঁচালী ও যাত্রার উদ্ভব হয়। খেউড় হইতে হয় আখড়াই। তর্জ্জা খেউড় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে হয় পরবর্ত্তী কালের কবিগান। আর হাফ্-আখড়াই আসে আখড়াই পাঁচালী ও কবিগানের মিলনের ফলে। পদাবলী কীর্ত্তন এবং প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী (মন্দিরা চামর যোগে দেবমঙ্গলগীত রীতি) পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে বিশুদ্ধভাবে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের যে পাঁচালীর বিষয়ে উপরে আলোচনা করিলাম তাহা তর্জ্জা খেউড় দাঁড়া কবি কবিগান আখড়াই হাফ্-আখড়াইয়ের মত একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।